নৃতাত্ত্বিকের চোখে : সত্যজিতের দুর্গার প্রাসঙ্গিকতা'

By Team Newsbritant- মে 2, 2021

ড. নবকুমার দুয়ারী,
ভারতীয় মানববিজ্ঞান সর্ব্বেক্ষণ সংস্কৃতি মন্ত্রালয়, ভারত সরকার, কলকাতা

এক

দক্ষিণবঙ্গে একগ্রামে গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় আলস্য শরীরে দক্ষিণ খোলা বারান্দায় মাটির মেঝেতে পাতা মাদুরে শুয়ে পড়ছিলাম ‘কথা মেঘ’পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দুই ‘মেদিনীপুরের দুর্গারা’। পড়তে পড়তে বারবার সামনে ভেসে ওঠে নানা বয়সে বারবার দেখা সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের টুকরো ছবি। ভেসে ওঠে সেই রোগা ছিপছিপে চেহারার কিশোরী দুর্গার আটপৌরে সরু পাড় থানকাপড় পরা দুই-মিষ্টি মেয়ের জীবন কাহিনীর নানান চিত্র। মনে পড়ে তার শিশু বয়সের ছবি। মনে পড়ে তার গ্রাম্য সামাজিক পরিবেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা স্থানে উপস্থিতি। মা-বাবা, পিসি, ভাই ও প্রতিবেশী কাকিমা, জ্যাঠাইমা সমবয়সী খেলার সাথীদের মধ্যে বেড়ে ওঠার নানান কথা। কানে ভেসে আসে রবিশঙ্করের ধারাল সংগীতের সুর। যা এসব কিছু ধরা দিল ভারতীয় এক গ্রামীন সমাজের এক সময়ের সাক্ষী হিসাবে। ভাবনায় এল ছোট বয়সে দেখা পথের পাঁচালী আর আজ মাঝ বয়সে এসে একই চলচ্চিত্র দেখার মধ্যে কতটা তফাৎ। গভীর ভাবে দাগ কাটে দুর্গার জীবনে না বলা কত কথা, তার অনুভূতি, অভিব্যক্তি, স্বপ্ন, আঘাত, আবেগ, ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য মূলবোধ ইত্যাদি। আবার সেই সাথে তুলনামূলক বিচারে মনে আসে সমাজে সমকালীন দুর্গার নানান কথা। ‘ভাবনায় আসে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তনের নানান দিক -।

দুই

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিকে সত্যজিৎ রায় বাংলার এক গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন তার তৈরী পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের মূলত দৃশ্যের মাধ্যমে। সেখানে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরেছেন পুকুর-ঘাট, জলের উপর পোকা মাকড়ের ঘুরে বেড়ানো, বাঁশবন, পাড়ার মধ্যে সরু ছায়াপথ, নানা ফল-ফুলের গাছপালা, সাপ-ব্যঙ, মাকড়সা, গরুবাছুর, ইসি, কুকুর, বেড়াল, কালমেঘ, অঝোরে বৃষ্টি, শরতের কাশফুল, রেলগাড়ি আরও কত কিছু। আবার তেমনি দেখিয়েছেন গ্রাম্য জীবন-জীবিকার সাথে দৈনন্দিন কাজকর্ম, ঘরবাড়ি, স্থাপত্য, আসবাবপত্র, ধর্মীয় জীবন, পোষাক পরিচ্ছদ, কেশসজ্জা, খাদ্য, তামাক সেবন, জাত পেশার কাজকর্ম, দুর্গাপূজা, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, লিঙ্গ বৈষম্য, পারিবারিক শিক্ষা, শান্তি পরিবারে তিন পুরুষের বসবাস ও সংঘাত। নারীদের সংসারে দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা; অবসর বিনোদন, যাত্রাপালা, বায়োস্কোপ দেখা, লোক ক্রীড়া, দৈনন্দিন কাজের মধ্যে মহিলাদের যোগাযোগ ও কথাবার্তা, কটুক্তি, আর্থিক অনটন, দৈন্যতা, বিত্তশালী বিধবার দাম্ভিকতা, কোমল হৃদয়ের এক প্রৌড় প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্য, দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ, ছোটদের চড়ুইভাতি, প্রতিবেশীর বিয়েতে যোগদান, দোকান পাঠ, শিক্ষার পরিকাঠামো ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, গ্রামান সংগঠন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দুর্গা যেন কেন্দ্র চরিত্র। তাই এই কথা বলতে বলতে প্রথমে বলা দরকার তার শৈশব বয়সের কথা। সমাজের প্রতিটি মানুষ তার বাল্য বয়সে বা ছোটবয়সে বয়সে ছোটদের আদব কায়দা শিক্ষাগ্রহণ করে মাতা-পিতা, পরিবারের বয়ঃজেষ্ঠ্য ও সমবয়সী খেলার সাথীদের কাছে। কারণ আগামী দিনে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য এটাই তো প্রয়োজন। আর এই আপনা-আপনি শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিটি হল দৈনন্দিন জীবনে সংসারে ও পেশাগত কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা ও সরাসরি হাতেনাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আবার ঠিক তেমনি সমবয়সী সাথীদের সাথে খেলাধূলার মাধ্যমেও। লিঙ্গ-ভেদে সমাজে কাজ-কর্ম পৃথক পৃথক হওয়া

পুত্র-কন্যা কিশোর বয়সে জ্ঞান অর্জন করে সেই সব কাজের। শেখে নিজ নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য ও মূল্যবোধকে। এই শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিটিকে বলা হয় socialization process। যা দুর্গার জীবনের শৈশব থেকে কিশোর বয়সে ভীষণভাবে বারবার উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায়।

তিন

এবারে দেখা যাক, দুর্গার জীবনে পরপর কি কি ঘটেছিল এবং সে কোন কোন ঘটনার সাক্ষী। সেসব কথা ক্রম অনুসারে ফেলে সংক্ষেপে আলোচিত হল এই স্বল্প পরিসরে। অন্যের বাগানে পেয়ারা না বলে নেওয়া যে অপরাধ সেটা দুর্গা বুঝেছিল শৈশবে। তাই মাকে নিয়ে লুকিয়ে পেয়ারা (ইন্দির ঠাকরুনের) পিসি হাতে দিয়েছিল। একথা তার মা জানতে পারে যখন প্রতিবেশী নালিশ জানায়। এরপর সে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুরঝিকে বলে মেয়েটাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত না করতে। ইন্দির ঠাকরুনের সাথে (দুর্গার মা) সর্বজয়া সামান্য এক সামান্য ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয়। অভিমানে ও দুঃখে সে বাড়ি ছেড়ে এই গ্রামে রাজুর বাড়িতে চলে যায় কয়েকদিন। এ দৃশ্যের সাক্ষীও দুর্গা। তার পিসির অনুপস্থিতি সে অনুভব করে সদা-সর্বদা। দুর্গা যখন জানল যে তার ভাই হয়েছে- তখন সে কী আনন্দ। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়। এই সুখবরটা শুনে ইন্দির ঠাকরুন নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে তাঁর পোটলায় সমস্ত ছেঁড়া-আধময়লা পরনের শাড়ী কাপড় নিয়ে হাজির হয় আঁতুর ঘরে চৌকাঠের গোড়ায়। বলেছিল- কাঁথাখানা সরা বউ,মুখখানি দেখি। দিব্যি হয়েছে বলতে বলতে আনন্দে অশ্রু মুছেছিল শাড়ী দিয়ে। হরিহরের ইচ্ছে পুত্রের অন্নপ্রাশনটা ধুমধাম করে আয়োজন করা আমন্ত্রিতরা জানবে যে সর্বজয়া কত ভালো রান্না করে। এদের মধ্যে কথোপকথনে হরিহর বলে বংশের ধারা বজায় রাখার জন্য পুত্র লাভ হয়েছে। এসময় দৌড়ে আঁতুরঘরে প্রবেশ করে দুর্গা। তাকে তার বাবা কোলে বসায়। আর বলে দুর্গার ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়ার কথা। এখান থেকে শিশু দুর্গা শোনে তার বিয়ের ব্যাপারে। তাই তার ভাবনা জীবনের কথা ভেবে মা দৈনন্দিন সংসারে কাজকর্ম শেখার কথা বলে এবং সে মাকে নানা কাজে সহযোগিতা করে।এমনকি সে শেখে গরুর পরিচর্যাও। শেষে সমবয়সী প্রতিবেশী মেয়েদের সাথে চড়ুইভাঁতিতে উনুন ধরানো রান্না করা ইত্যাদি। ভাই অপু বড় হয়। তাকে সকালে ঘুম থেকে তোলার দায়িত্ব দুর্গার। সে জানে ভাই-এর দুষ্টুমি। তাই সে কাতুকুঁতু দিয়ে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করে একদিন। ছেঁড়া কাঁথার ফুটোর মধ্যে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে ভাইয়ের বাম চোখটা খুলে বিছানা থেকে তোলে । অপুর ভেজা চুলে চিরুনি দেওয়া ও তাকে পাঠশালায় পড়তে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও তার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু কোন দিন সে মুখফুটে বলেনি যে নিজে পড়তে যাবে। বা ভাই-এর কোন ব্যাপারে তুলনা করতে। দুর্গা হয়তো জেনেছিল পুরুষশাসিত সমাজে এইরূপ যা-পুরুষের বিভেদ (লিঙ্গ বৈষম্য) প্রথা হিসাবে রয়েছে। আর সেটা সে বুঝেছিল এখানে পুরুষটি হল তার ভাই। সে যদি ভাল খায় ও ভাল পড়াশুনা করে সেটা তার কাছে আনন্দের। এসব ক্ষেত্রে কোন বিদ্রোহের অভিব্যক্তি নেই।

দুর্গা তার কিশোরী বয়সে অনুভূতিতে দেখেছে অভাব অনটনের সংসারে কত সমস্যা কত স্বপ্ন। দেখেছে বাবার অনুপস্থিতিতে মাকে এক হাতে অভাবের সংসার টানতে ও নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনের পর দিন কাটাতে। দেখেছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বয়সী স্ত্রীলোকের মধ্যে বাক্য সংলাপ। মান-অভিমান, অবজ্ঞা, আবেগ – ভালবাসা। দেখেছে বৃদ্ধা পিসিমা ও মায়ের সম্পর্ক ও সংঘাত দেখেছে, কী কষ্টের মধ্যে মার সংসার প্রতিপালন। আবার দেখেছে, কী কষ্টের মধ্যে পিসির সংসারে টিকে থাকা। তাই সে একদিন কথা প্রসঙ্গে (ভাই হরিহরকে) বলেছিল 'বুড়ো মানুষকে কে দেখে'। একদিন রাতে প্রদীপের মৃদু আলোতে বৃদ্ধা পিসি উবু হয়ে বসে তার পরনের ছেড়া কাপড় কুঁচে সেলাইয়ের জন্য সুতোর এক প্রান্তভাগ মুখের মধ্যে বারবার ভিজিয়ে মসৃণ করে সুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে বারবার বিফলতা মনে তার গভীরভাবে দাগ কাটে। দুর্গা আরো দেখেছে দৈনন্দিন সংসার জীবনে পিসির টুকটাক কাজকর্ম। সে খাওয়ার পর তার হাত ধোয়া

জলটুকু ফেলতো উঠোনের এক কোণে লাগানো বেগুন গাছটির উপর। গাছে বেগুন ফললে যেমন সকলে খাবে আবার সেটাই হবে নরম ভাতের সাথে তার বয়সে উপযোগী অতি উত্তম খাওয়ার। অপুকে খোলা বারান্দায় দোলায় ঘুম পাড়ানোর সময় সে গাইতে গাইতে প্রকাশ করেছে তার এই সংসার ছেড়ে.পরপারে যাওয়ার ইচ্ছের কথা। দুর্গা জানতো ভাইয়ের প্রতি বাবা ও মা'র অধিক স্নেহ-ভালবাসা। তাই একদিন বাসায় ফেরী করতে আসা ময়রার মিষ্টি কেনার জন্য অপুকে বাবার কাছে পয়সা চাইতে পাঠিয়েছিল। তাকে মায়ের কাছে কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। একদিন পাড়ায় সমবয়সীদের সাথে তাদের বাড়িতে পুঁতির মালা গাঁথার সময় একটা মালা খুঁজে না পাওয়ায় ঐ পরিবারের এক বিধবা মহিলা দুর্গার বাড়িতে নালিশ জানায় যে ঐ মালা চুরি করেছে বলে। শুনতে হয় একটি কথা – 'যেমন মা, তেমনি মেয়ে'। ঐ চরম অসম্মানজনক কথা মুখ বুজে শুনতে হয়েছে সর্বজয়াকে। এরপর দুর্গা বাড়ির উঠানে আসতেই মা চুলের মুঠী ধরে মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরের উঠুনের প্রাচীরের চৌকাঠের বাইরে বের করে পুরাতন ভাঙা কাঠের দরজাটিকে ভেতর থেকে বন্ধ করে সেখানেই সে মাটিতে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। ওই সময় উপস্থিত ইন্দির ঠাকরুনের বাকরুদ্ধ অভিব্যক্তি। কিছুটা দূরে দাঁড়ানো অপু দেখেছিল মায়ের সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ও দিদির কঠিন শাস্তি। অপুর চোখে তখন ভীত সন্ত্রস্থ চিহ্ন। সন্তানের উপর মায়ের এই কঠিন শাস্তির অনুতাপ পরক্ষণে বুঝেছিল দুর্গা ও অপু। সে সারাটা সময় ছিল অনুশোচনা ও অনুতাপে জর্জরিত। তাই সে অপুকে বলে 'ভাত বাড়া আছে', দিদিকে ডেকে আনার জন্য। যেই এই কথা শোনা অপু আনন্দের সাথে দৌড়ে দিদিকে ডেকে আনে। এই ঘটনার পর ইন্দির ঠাকরুনও খুব কষ্ট পেয়েছিল। তাই একদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় সে ভাইঝি দুর্গাকে ডেকে তার কোলে মাথা রেখে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে শোনায় রোমাঞ্চকর এক রাক্ষসের গল্প।

ছোট বয়সে ভাই বোনের কোনকিছুকে নিয়ে মারামারি হয়নি এমনটি বোধহয় অবাস্তব। আবার পরক্ষণে দু'জনে পূর্বের কথা ভুলে মিলে মিশে থাকে একসাথে। এক্ষেত্রে দুর্গা ও অপু ব্যতিক্রম নয়। তাই তো তারা দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছে আচার, দেখতে গিয়েছে কাশবন পেরিয়ে রেলগাড়ি, শুনেছে টেলিফোনের স্তম্ভে কান পেতে শোঁ শোঁ শব্দ। দুর্গা দেখেছে পিসির অস্বস্তি ও অসুস্থতা এবং অবশেষে বাঁশবাগানে বসা অবস্থায় মৃত্যু। দেখল তার এই পিসির সর্বক্ষণের সঙ্গী টালপড়া পেতলের ঘটিটাকে সশব্দে গড়িয়ে বাঁশের ছায়া ঘেরা পুকুরের জলে পড়তে ও তা সামান্য ঢেউ তুলে দোল খেতে খেতে ভাসতে। এখানে বাগরূদ্ধ দুর্গা হয়তো ভাবছিল সমাজে মেয়েদের ঘাত প্রতিঘাতের পর বৃদ্ধ বয়সে শেষ পরিণতির কথা।এই ঘটিটি তার প্রতীকি স্বরূপ। সে আরও হয়তো ভেবেছিল তার ভালোবাসা ও স্নেহের জায়গায় কিছুটা অভাবের কথা। সে দেখলো পিসিমার অন্তিমযাত্রা। আবার এও দেখলো পরিবারে একজন চিরতরে চলে যাওয়া স্বজন হারানোর ব্যথা ও শূন্যতা। ইন্দির ঠাকরুনের এভাবে চলে যাওয়াটা যেন দুর্গার কাছে অধিক কষ্টের।

একদিন গুড় কিনে আনার জন্য সর্বজয়া দুর্গাকে দু'পয়সা হাতে দিয়ে বলেছিল- 'কয়েকদিন অপু পায়েস পায়েস করছে'। এই কথা শুনে সে কোন আপত্তি না করে সে গিয়েছিল গুড় কিনতে। দুর্গা ছিল ভীষণ সহ্যশীল ও ভাইয়ের প্রতি স্নেহশীল এবং পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ন। আবার তেমনি সে ছিল দয়াশীলও বটে। একদিন এক বাউল ফকির উঠোনে গান শুনিয়ে ভিক্ষে চাইতে এলে সে মাকে লুকিয়ে এক মুঠো চাল তার হাতে দিয়ে বিদায় জানায়। তার বয়ঃসন্ধিক্ষনে স্বপ্ন দেখেছিল তার বৈবাহিক জীবন। এরূপ স্বল্পর কথা প্রকাশ পেয়েছে তার সেই প্রতিবেশী এক সমবয়সী খেলার সাথীর বিয়েতে যখন সে উপস্থিত হয়ে এক নজরে দেখছিল তার শাড়ী-গয়না পরা ও আলতা পরার সেই মুহূর্তগুলি। সেই সময় তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠেছিল তার সেই স্বপ্ন। পাড়ার বাঁশবাগানে ভাইবোন বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার জ্বর হয়। প্রবল ঝড়ের

রাত্রিতে ভাঙা বাড়িতে অসহায় মা মারন সুরে অসুস্থ কন্যা আর ছোট পুত্র। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, ঘনঘন বিদ্যুতের ঝলকানি, বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ, পাল্লাহীন জানালায় ঝোলানো চাটাইয়ে দোল খাওয়া। ছায়া, ক্ষীন প্রদীপের আলো বাতাসে নিভু নিভু, ভাঙা দরজার কড়কড় আওয়াজ আর এদিকে দুর্গার থিস্থিতে দু'হাত তুলে মাকে ডাক। নিরুপায় মা অসুস্থ সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। অবশেষে দুর্গার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। ধীরে ধীরে থেমে যায় ঝড়ের গতি। রাত কেটে ভোর হয়। স্তব্ধ পরিবেশ। ঘুম ভাঙে ছোট অপুর। জিজ্ঞাসা করে 'মা দিদি ঘুমোচ্ছে'। সন্তান হারানো জননী কঠিন দুঃখ বেদনায় সে নিশ্চুপ এক শূন্যতার মাঝে তাকিয়ে।

এখন সকালে একা একা পুকুর পাড়ে দাড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে ভাবে তার দিদির কথা। স্নানের সময়, চুলে চিরুনী দেওয়ার সময় সে অনুভব করে দিদির অনুপস্থিতি। দিদির অভাবটা সে বোধ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রতিদিন পাঠশালায় পড়তে যাওয়ার সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে আকাশে কালো মেঘ । তারপর সে আবার বাড়ি থেকে ছাতাটা নিয়ে পাঠশালায় রওনা দেয়। সে বুঝেছিল বৃষ্টিতে ভিজলে কি ঘটনা ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে শিশু মনে ভয় সঞ্চয় হয়েছে তার দিদিকে দেখে। কয়েকমাস পরে হরিহর বাড়ি ফিরে আসে। ডাকে খোকা-দুর্গা বলে। অপু পাঠশালা থেকে ফিরে দূরে দাঁড়িয়ে। স্ত্রী সর্বজয়া বাকরূদ্ধ অবস্থায় অবস্থায় বারান্দায় রাখে স্বামীর পা ধোয়ার জল, গামছা ও চৌকী। হরিহর একের পর এক থাল থেকে ঘর সংসারের জিনিষ স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। দুর্গার জন্য রঙিন শাড়ী তুলে দেওয়ার সাথে সাথে সে তার বুকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বারান্দায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। হরিহর তখনই বুঝলো যে দুর্গা মারা গেছে। বাকরূদ্ধ হরিহর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ও দাঁড়াতে না পেরে সর্বজয়ার পাশে বসে পড়ে কন্যা বিয়োগের ব্যথায়। কয়েকদিন কেটে যায়। স্বামী স্ত্রী আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয় এই পিতৃ পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে কাশী যাওয়ার জন্য। জিনিসপত্র গোছগাছ চলছে। এমন সময় গ্রাম ও প্রতিবেশী শুভাকাঙ্খী বয়স্ক ব্যক্তিরা এসে হরিহরকে উপদেশ দেয় এই ভিটেমাটি ছেড়ে না যাওয়ার জন্য। অপু দেওয়ালের তাকে হাতে দিয়ে দেখালো একটা নারকেল মালা। মালাটি পড়ল মেঝেতে। আর অমনি দেখলো একটা মাকড়শ'কে মালা থেকে বেরিয়ে যেতে । আর দেখলো একটা পুঁতিরমালা । অপুর মনে পড়ল সেই চুরি যাওয়া পুঁতির মালার কথা। আর সাথে সাথে মালাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিমেশের মধ্যে বাঁশবাগানে এক পানা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে জলে ছুঁড়ে দিল। মালাটি টুপ করে জলে পড়ল। পানা সরে গেল। আবার ধীরে ধীরে পানা পূর্বের অবস্থায় পৌঁছল। সে ফিরল বাড়িতে। অন্য কেউ জানলো না এ ব্যাপারটা। অবশেষে হরিহর, সর্বজায়া ও অপু গরুর গাড়িতে চেপে রওনা হল কাশীর উদ্দেশ্যে। এই বিদায়কালে এদের মনে এক বিষাদের ছাপ । এই বিষাদ কেবল ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ার জন্য নয়। এ তার থেকেও বেশি। সেটা হল আজ তাদের সাথে নেই সন্তান দুর্গা, আর অপুর দিদি।

চার

দুর্গার মৃত্যুর পরে অপুর সেই পুঁতির মালা ছুঁড়ে ফেলার দৃশ্যটা মনে পড়ে যখন কোথাও দেখি পুকুর পাড়ে নুইয়ে পড়া বাঁশগাছের ছায়া । দুর্গার উপস্থিতিটা যেন পুকুর পাড়ে বাঁশ বাগানের মধ্যে দেখতে পাই। এই সেই বাঁশবাগান এই বাগানের মধ্যে দিয়ে সে প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাতায়াত করত। যেখানে তার পিসি মারা গেছে । যেখানে সে বৃষ্টিতে ভিজে ছিল । আরও কত কথা । এখন যেন সেই পুকুরে দেখি পুঁটি মাছের ঝাঁককে ঘুরে বেড়াতে, দেখি চরে বেড়াতে হাঁস, পুকুরের কোনে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকা ডাকপাখি, দেখি শালুক, শাপলা, জলের উপরে ভেসে বেড়ানো এক বিশেষ ধরনের সন্ধিপদ শ্রেণীর পোকা । মনে পড়ে দুর্গার কথা – যখন দেখি পুকুর পাড়ে হেঁটে যাওয়া লোকজনের জলে ছায়া, যখন দেখি

গ্রামে কোন বৃদ্ধার সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মেলামেশা তখন মনে পড়ে ইন্দির ঠাকরুন, অপু ও দুর্গার কথা।

আবার কখনও কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করি বর্তমান দিনে দুর্গারা কি পথের পাঁচালীর দুর্গাকে সঠিকভাবে চিনেছে, জেনেছে কি তার সমাজে আর্থ-সামাজিক ও মূল্যবোধের কথা। একথা ঠিক বর্তমান দিনে দুর্গারা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশে ও একক পরিবারে বড় হচ্ছে। সুযোগ ঘটেনি যৌথপরিবারে ঠাকুমা, পিসিম, কাকা, কাকিমার স্নেহে বড় হওয়া। বঞ্চিত হয়েছে প্রতিবেশী খেলার সাথীদের সাথে দৈনন্দিন মেলামেশার। পারেনি যেতে প্রকৃতির কাছাকাছি। পারেনি প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে। এরা এখন ভীষণ ব্যস্ত। আধুনিকতা ভীষনভাবে প্রভাব ফেলেছে এদের জীবনে। এরা দেখছে স্বার্থপরতা, খুন, জখম, বলাৎকার, হিংসা, প্রতিহিংসা এবং স্বপ্নপূরণের সহজ পথ। একথা সত্য আজকের দুর্গা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে, পালন করে চলেছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তার ভূমিক। শিখেছে তার অধিকার ছিনিয়ে নিতে। শিখেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। জেনেছে তার ভালো মন্দের বিচার । পৌঁছেছে তার ছোট গ্রামের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সময় পাল্টেছে, সমাজ বদলেছে, আর স্বাভাবিক নিয়মে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সৃষ্ট দুর্গা ও সমকালীন দুর্গার জীবন দর্শনে ও জীবনের গতির মধ্যে অনেক অনেক ফারাক ঘটেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে তাদের জীবনে নানান ক্ষেত্রে। তবুও যেন মনে হয় পথের পাঁচালির দুর্গা থেকে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে। যেমন তার নমনীয়তা, ধৈর্য্য ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। তবুও যেন মনে হয় পথের পাঁচালির দুর্গা থেকে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে। যেমন তার নমনীয়তা, ধৈর্য্য ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। আর রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি কালজয়ী এই চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা।

[Ref: **press me**]